আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৎকালীন আরবের ভৌগলিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা (الْعَرَبُ، الأَرْضُ وَالشَّعْبُ، الحُكْمُ وَالْاِقْتِصَادُ، الدِّيَانَةُ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

সমসাময়িক আরবের বিভিন্ন রাজ্য ও নেতৃত্ব প্রসঙ্গ (الحُكْمُ وَالْإِمَارَةُ فِي الْعَرَبِ)

আরব উপদ্বীপে নাবী সাঃ-এর দাওয়াত প্রকাশের প্রাক্কালে দু’প্রকারের রাজ্য শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

১. মুকুট পরিহিত সম্রাট। তবে তারা প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীন বা মুক্ত ছিলেন না।

২. গোত্রীয় দলনেতাগণ। মুকুট পরিহিত সম্রাটগণের যে মর্যাদা ছিল অন্যান্য খ্যাতিসম্পন্ন গোত্রীয় দলনেতাগণেরও সেই মর্যাদা ছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি ছিল তা হচ্ছে, তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। যে সকল সাম্রাজ্যে মুকুটধারী সম্রাটগণের প্রশাসন কায়েম ছিল সেগুলো হচ্ছে শাহানে ইয়ামান, শাহানে আলে গাসসান (শামরাজ্য) এবং শাহানে হীরাহ (ইরাক)। অবশিষ্ট অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই ছিল গোত্রীয় দলনেতার প্রশাসন।

ইয়ামান সাম্রাজ্য (**الْمُلْكُ بِالْيَمَنِ**) :

আরবে ‘আরিবার অন্তর্ভুক্ত যে সকল সম্প্রদায় প্রাচীনতম ইয়ামান সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত ছিল তারাই ছিল সাবা সম্প্রদায় ভুক্ত। প্রাচীন ‘উর’ (ইরাক) ভূখন্ডের বহু পুরাতন ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের ধ্বংসস্তুপ থেকে যে সকল তথ্য প্রমাণাদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাতে খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর পূর্বের সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতকে তাঁদের অভ্যুদয় সূচিত হয়েছিল বলে তথ্য প্রমাণাদিসূত্রে অনুমিত হয়েছে। গবেষণালব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে তাঁদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যে ধারণা করা হয়ে থাকে তা হচ্ছে নিম্নরূপ:

১. খ্রীষ্টপূর্ব ৬২০ হতে ১৩০০ অব্দ পর্যন্ত।

এসময়ে কিছু নির্দিষ্ট দেশসমূহে তাদের রাজত্ব ছিল বলে জানা যায়। যাওফ’এ অর্থাৎ নাযরান ও হাজরামাওত এর মধ্যবর্তী স্থানে তাদের আধিপত্য প্রকাশ পায়। অতঃপর তানমূ অধিকৃত হয় এবং পরবর্তীতে তাদের সাম্রাজ্য ব্যাপকভাবে প্রশস্ত হয় ও বিস্তার লাভ করে এমন কি তাদের রাজনৈতিক প্রভাব উত্তর হিযাজের ‘মা‘আন ও উ‘লা’ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

কথিত আছে যে, তাদের কলোনী বা উপনিবেশ আরববিশ্বের বাইরেও বিস্তার লাভ করে। ব্যবসায় ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। অতঃপর মায়ারিবের সেই বিখ্যাত বাঁধ নির্মাণ করা হয় যা ইয়ামানের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লে-খযোগ্য একটি বিষয় ছিল। তাদেরকে পৃথিবীর প্রভূত কল্যাণ দেয়া হয়েছিল। কুরআনে এসেছে, (**حَتَّى نَسُوْا الذِّكْرَ وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا**) ‘পরিণামে তারা ভুলে গিয়েছিল (তোমার প্রেরিত) বাণী, যার ফলে তারা পরিণত হল এক ধ্বংশপ্রাপ্ত জাতিতে।’

সেই সময়কালে শাহানে সাবার মর্যাদাসূচক উপাধি ছিল ‘মোকাররবে সাবা’। তাঁর রাজধানী ছিল সিরওয়াহ- যার

ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকা চিহ্ন আজও মায়ারেব শহর থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ৫০ কিলোমিটার পথের দূরত্বে ও 'সনয়া' থেকে ১৪২ কিলোমিটার পূর্বে দেখতে পাওয়া যায় এবং তা খারিবা নামে প্রসিদ্ধ রয়েছে। এ রাজ্য বংশানুক্রমে ২২ থেকে ২৩ জন বাদশা দেশ শাসন করেন।

২. খ্রীষ্টপূর্ব ৬২০ অব্দ থেকে ১১৫ অব্দ পর্যন্ত।

এসময় কালে তাদের রাজত্বকে 'সাবা সাম্রাজ্য' বলা হতো। 'সাবা' সম্রাটগণ মোকাররব উপাধি পরিত্যাগ করে 'রাজা' (বাদশা) সম্মানসূচক উপাধি গ্রহণ করেন এবং 'সারওয়াহ' এর পরিবর্তে মায়ারেবকে সাম্রাজ্যের রাজধানী ঘোষণা দেন। সেই শহরের ধ্বংসস্তুপ আজও 'সনয়া' নামক স্থানের ১৯২ কিলোমিটার পূর্বে পরিদৃষ্ট হয়।

৩. খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে ১১৫ অব্দ পর্যন্ত।

এ সময়ে তাদের রাজত্বকে 'প্রথম হিমইয়ারী' বলা হয়। কেননা সাবা রাষ্ট্রের উপর 'হিময়ার' গোত্র প্রাধান্য লাভ করে ও সাবা রাজ্য সংকুচিত হয়ে পড়ে। তাদের রাজ্যকে 'সাবা ও যূ রায়দান' বলা হয়। আর তারা মায়ারেবের পরিবর্তে 'রায়দানকে' রাজধানী করেন। পরে রাজধানীর নাম 'রায়দান' পরিবর্তন করে 'জিফার' রাখা হয়। এ শহরের ধ্বংসাবশেষ আজও 'ইয়ারিম' শহরের নিকটে এক গোলাকার পর্বতে পরিদৃষ্ট হয়।

এ সময় থেকেই সাবা সম্প্রদায় এর পতন শুরু হয়ে যায়। নাবেতীয়গণ প্রথমে হিজাযের উত্তর প্রদেশে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নিয়ে সাবা সম্প্রদায়ের বসতি স্থাপনকারীদের সেখান থেকে বহিস্কার করেন। অধিকন্তু রুমীগণ মিশর, শাম এবং হেজাজের উত্তরাঞ্চল দখল করে নেয়ার ফলে সমুদ্রপথে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে ক্রমান্বয়ে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য সংকুচিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে ক্বাহত্বানী গোত্র সমূহও নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ার ফলে নিজ নিজ আবাস স্থল পরিত্যাগ করে তাঁরা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েন।

(৪) ৩০০ খ্রীষ্ট্রাব্দের পর থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত।

এ সময়ে তাদের রাজত্বকে 'দ্বিতীয় হিমইয়ারী' বলা হয় এবং তাদের রাজ্য 'সাবা, যূ রায়দান, হাজরামাওত ও ইয়ামনত' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ইয়ামানের মধ্যে অব্যাহতভাবে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা ঘটতে থাকে। একের পর এক বহু বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে এবং এর ফলে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের অবাঞ্ছিত সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। এমন কি এ পর্যায়ে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হয় যার ফলশ্রুতিতে ইয়ামানের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সেই যুগের রুমীগণ এডেন দ্বীপে সৈন্য সমাবেশ করে তার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর হিময়ার ও হামদানের পারস্পরিক আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে হাবশীগণ রুমী গোত্রের সহায়তায় তাঁদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে। হাবশীগণের এ দখলদারিত্ব স্থায়ী থাকে ৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এর পর ইয়ামানের স্বাধীনতা এক প্রকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। কিন্তু মায়ারিবের মশহুর বাঁধে শুরু হল ফাটল। সেই ফাটল ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পেতে অবশেষে ৪৫০ অথবা ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাঁধটি ভেঙ্গে যায়। এ বাঁধের ভাঙ্গনের ফলে ভয়াবহ প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে যায়, যার উল্লেখ কুরআন শরীফের (সুরা সাবা) সায়লে আরেম নামে উল্লেখিত হয়েছে। এ ভয়াবহ প্লাবনের ফলে গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়ে যায় এবং বহু গোত্র নানা দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে ৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ভিন্ন ধাঁচের এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ইয়ামানের ইহুদী সম্রাট 'যূনওয়াস' নাজরানের খ্রীষ্টানদের উপর এক ন্যাক্কারজনক আক্রমণ পরিচালন করে খ্রীষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ করে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ

করার জন্য তাঁদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ কোনক্রমেই এতে সম্মত না হওয়ায় ‘যূনওয়াস’ কতগুলো গর্ত খনন করে তাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন এবং সেই সকল অগ্নিকুন্ডে খ্রীষ্টানদের নিক্ষেপ করেন। কুরআন শরীফের সূরাহ বূরুজের (قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ) শেষ অবধি আয়াত দ্বারা এ লোমহর্ষক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ ঘটনার ফল এ দাঁড়ায় যে রুমীয় সম্রাটগণের নেতৃত্বে খ্রীষ্টানগণ আরব উপদ্বীপের শহর ও নগরের উপর বার বার আক্রমণ চালিয়ে বিজয়ী হতে থাকেন। এতে উৎসাহিত হয়ে ইহুদীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁরা সংকল্পবদ্ধ হয়ে যান এবং এ প্রতি আক্রমণে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা দানের জন্য হাবশীগণকে সরবরাহ করা হয়। রুমীগণের সহযোগিতা লাভের ফলে হাবশীগণ বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেন এবং ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইরয়াতের নেতৃত্বে ৭০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং পুনরায় ইয়ামানের উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। হাবশা সম্রাটের গর্ভনর হিসেবে ইরয়াত ইয়ামানের শাসন কাজ পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু আবরাহা বিন সাবাহ আল আশরাম নামে তাঁর অধীনস্থ এক সৈনিক ৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে হত্যা করে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে হাবশ সম্রাটের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলতে সক্ষম হন এবং খুশী করেন। ইনি ছিলেন সেই আবরাহা যিনি ক্কাবা’হ গৃহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বিশাল হস্তী বাহিনী সহ ক্কাবা’হ অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষী বাহিনী কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হন। আসমানী গ্রন্থ আল কুরআনে এ ঘটনা ‘আসহাবে ফীল’ (হস্তীবাহিনী) নামে প্রসিদ্ধ রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ফীলের ঘটনার পর সনয়া ফিরে আসার পর তাকে ধ্বংশ করেন। তারপর তার পুত্র ইয়াকসূম সিংহাসনে আরোহন করেন। এরপর রাজত্ব করেন দ্বিতীয় পুত্র মাসরূক। তাদের উভয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা ছিল তাদের পিতার থেকেও খারাপ এবং ইয়ামানবাসীকে নিপীড়ন-নির্যাতন ও যুলূম-অত্যাচারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্বভাবের।

আসহাবে ফীলের ঘটনার পর ইয়ামানবাসীগণ পারস্যরাজ্যের সাহায্যপুষ্ট হয়। এবং হাবশীগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইয়ামানবাসীগণ সাইফ বিন যূ ইয়াযান হিময়ারীর সন্তান মা’দীকারবের নেতৃত্বে হাবশীগণকে সে দেশ থেকে বহিস্কার করে মুক্ত স্বাধীন সম্প্রদায় হিসেবে মাদী করেককে সম্রাট মনোনীত করেন। এ ছিল ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের পর মা’দীকারাব কিছু সংখ্যক হাবশীকে নিজের খেদমত এবং রাজদরবারের জাঁকজমক বৃদ্ধির কার্যে নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ অবিমৃষ্যকারিতা প্রসূত ভ্রান্ত নীতির কারণে ‘দুগ্ধ কলা সহকারে সর্প পালন’ প্রবাদ বাক্যটি এক মর্মান্তিক সত্যে পরিণত হয়ে যায়। প্রতারণা করে ঐ হাবশীগণ একদিন মা’দীকারাবকে হত্যা করার মাধ্যমে যূ ইয়াযান পরিবারের শাসন ক্ষমতাকে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেয়। আর দেশটি পারস্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এরপর থেকে পারস্য বংশোদ্ভূত কয়েকজন গভর্ণর একাদিক্রমে ইয়ামান প্রদেশের শাসন সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করতে থাকেন। অবশেষে সর্বশেষ পার্সী গভর্ণর বাযান ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করলে ইয়ামান পারস্য শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামী জীবনধারা ও শাসন সৌকর্যের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে।[1]

ফুটনোট

[1] সৈয়দ সোলাইমান নদভী (রহঃ) ‘তারিখে আবযুল কুরআন’’ ১ম খন্ড ১৩৩ পৃঃ থেকে শেষ পযন্ত বিভিন্ন

ঐতিহাসিক প্রমাণাদির আলোকে সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিবরণসহ আলোচনা করেছেনত, মওদূদী (রহ.)ও তাফহীমুল কুরআনের চতুর্থ খন্ডে ১৯৫-১৯৮ পৃষ্ঠায় বিবরণাদি একত্রিত করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের উৎস হিসেবে এ সব ক্ষেত্রে বেশ মত বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি কোন কোন গবেষক বিবরণাদি পূর্ববর্তীগণের কাহিনী বলে বর্ণনা করেছেন। {إِنْ هٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} (٨٣) سورة المؤمنون}

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5851

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন